ভাস্কর রায়

পুনর্লিখনে স্যাক্রিফাইস

আমাদের মনোজগতে প্রতিনিয়ত যে শব্দ পড়ে তার কোন পরম্পরা নেই, যেমন নেই দৃশ্যবস্তুর সুসংহত বিন্যাস। এই-সবের প্রকৃত নিয়ন্তা স্মৃতি যা আদতে 'বিস্মরণের' সুবিশাল সৌধ। যে মানুষের দৃষ্টি তার দৈনন্দিন জীবন-যাপনের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে যায় না স্মৃতি তার কাছে কোন জগত তৈরি করেনা। সে প্রাত্যহিকতার ভারে পীড়িত, ফলে নিরালম্ব। আমাদের যা কিছু গভীরতম, যা তাৎক্ষণিকের প্রয়োজনে ক্ষয় হয়না, তার সবটাই 'বিস্মরণের' অমোঘ প্রক্রিয়ায় স্মৃতির আধারে জমা পড়ে। কবিতা স্মৃতি-অনুগামী, স্বপ্নের মতোই আকস্মিক এর 'বিস্ফোরণ'। 'নগ্ন নির্জন হাত'—কথাটির কোন আক্ষরিক অর্থ করা যায় না, কারণ কবিতার পরিমণ্ডল তৈরি হয় অনুভূতির অনুষঙ্গে যা স্মৃতি-স্বপ্ন উৎসারিত। তারকোভস্কি কবিতার এই অন্তর্নিহিত সত্বাটিতে পান চলচ্চিত্র-ভাষার মূল সূত্র। চলচ্চিত্রের সাঙ্গীতিক কাঠামোর কথা অনেকেই বলে থাকেন যেহেতু সুরের মতো চলচ্চিত্রের চিত্রকল্পও গড়ে ওঠে প্রত্যক্ষ বাস্তবের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণে। এই প্রত্যক্ষ বাস্তবের যথাযথ পরিবেশনেই সৃষ্টি হয় চিত্রকল্পের অমেয় পরিধি, আর এখানেই কবিতার সঙ্গে চলচ্চিত্রের মিল।

মহৎ কবিতা যেমন কেবল বুদ্ধি-গ্রাহ্য নয় তেমনি মহৎ চলচ্চিত্রও নয়।

গত দু-দশক ধরে চলচ্চিত্র-সমালোচনার যে কটি ধারা চালু হয়েছে সেগুলিকে আমরা মূলত চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন, মার্ক্সীয় বিশ্লেষণাত্মক, ভাষাতাত্ত্বিক (সেমিওলজিকাল), স্ট্রাক্‌চারালিস্ট এবং মনস্তাত্ত্বিক যা লাকাঁর দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। শেষোক্ত তিনটিরই সাধারণ ভিত্তি ভাষাতত্ত্ববিদ্যা। চলচ্চিত্র সমালোচনায় এই চারটি ধারারই ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে এগুলি শেষপর্যন্ত একটি বিশেষ ছবির মূল্যায়নের পরিবর্তে কতগুলি সাধারণ তত্ত্বের আলোচনাতে পর্যবসিত হয়। যেমন ধরা যাক স্ট্রাক্‌চারালিস্ট বিশ্লেষণের পদ্ধতিটি। এর বিচারে 'স্যাক্রিফাইস্' ছবিটি মূলত একটি নীতিকথা (প্যারাবল) যেমন যিশু খ্রীস্টের জীবন কাহিনী একটি নীতিকথা। এই নীতিকথার মূল বাণী, মানুষের মুক্তি আনতে পারে একমাত্র ব্যক্তির আত্মাহুতিই (স্যাক্রিফাইস)। সিদ্ধান্তটি ছবিটির ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য। কিন্তু এ ধরণের আলোচনা থেকে আমরা কোন সূত্রই পাইনা—কেন এই নীতিকথা অন্যান্য নীতিকথা, যেমন ঈশপের নীতিকথা থেকে ভিন্ন।

স্ট্রাক্‌চারালিস্ট পদ্ধতিটি অন্যান্য বিষয়ের মতোই ছবিকেও একটি পাঠবস্তু (টেক্সট) বলে ধরে। এই পদ্ধতিটির আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে ওই পাঠ-বস্তুতে বিভিন্ন 'কোডের' পাঠ-উদ্ধারে (ডিকোডিং)। 'কোড'-গুলি সাধারণত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক হয়ে থাকে এবং পাঠবস্তুকে জড়িয়ে থাকে। 'স্যাক্রিফাইস্' ছবিতে অনেকগুলি 'কোড'ই আবিষ্কার করা যায়, তবে এগুলির পাঠোদ্ধার আমাদের বলে না কীভাবে ছবিটি একটি সরল নীতিকথার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে জটিল শি--রূপ নেয়।

মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির বিশ্লেষণে আলেকজাণ্ডারের আত্মোৎসর্গ আসলে তার মর্ষকামিতারই চূড়ান্ত পরিণতি। আলেকজাণ্ডারের আত্মত্যাগের সৃষ্টিশীল দিকটিই এ-আলোচনা থেকে বাদ পড়ে। আত্মোৎসর্গ বস্তুত ভালোবাসারই অভিব্যক্তি। মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে 'স্যাক্রিফাইসের' মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ভোগবাদী সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। প্রতিবাদ নিঃসন্দেহে, কিন্তু প্রতিবাদ বলতে যে-অর্থে মার্কসবাদীরা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা বোঝে এটি তার বিপরীত মেরুতে। মানুষের নৈতিক পুনরুত্থানই এই প্রতি-বাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য এবং সামাজিক পরিবর্তন একমাত্র একে কেন্দ্র করেই হতে পারে। তাছাড়া তারকোভস্কি ব্যক্তির একক প্রচেষ্টাতেই তার কর্মের শুদ্ধতা খুঁজে পান। গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপে তাঁর কোন বিশ্বাস ছিল না। আমাদের এ লেখার উদ্দেশ্য নয় কোন তত্ত্বের অবতারণা যদিও কিছু তত্ত্বের উল্লেখ

অনিবার্য। কবিতা যেমন চলমান জগতের প্রতিমূর্তিমাত্র এবং ফলত রহস্যময় ও দ্ব্যর্থবোধক এবং সেই কারণে অনন্যসৃষ্টি, তেমনি তারকোভস্কি তাঁর 'স্যাক্রিফাইস' ছবিতে যে অনন্য জগত সৃষ্টি করেছেন আমরা পারি শুধু এরই অসংখ্য প্রতিমূর্তি গড়তে।

প্রাচীন গ্রীকদের কাছে সময়ের ক্রমিক অগ্রগতির কোন অর্থ ছিল না। আরিস্ততল বিশ্বাস করতেন না তিনি পিউনিক যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বাস করছেন। মানুষ ক্রমশঃ উন্নত হচ্ছে, একটি পূর্বনির্ধারিত চরম লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে এমন ধারণা মূলত জুডিও-খ্রীস্টীয়, গ্রীক দর্শনে এর কোন স্থান ছিল না। সময় একই জায়গায় বারবার ফিরে আসে, জগত অন্তহীন আবর্তনের প্রক্রিয়ায় বারবার একই রূপ পরিগ্রহ করে—এই ভাবনাটি হিরাক্লিতাসের দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। নীট্‌ৎশের 'অন্তহীন আবর্তনের' তত্ত্বটি হিরাক্লিতাসের এই দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত। 'স্যাক্রিফাইস্' ছবির প্রথম দৃশ্যেই এই দার্শনিক তত্ত্বের কথা উচ্চারিত হয়। অটোই এই তত্ত্বটির প্রসঙ্গ তোলে। ছবিটির জটিল বিন্যাসে অটো চরিত্রটি একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। অটো যেমন একদিকে আলেকজাণ্ডারেরই অন্য সত্তা তেমনি একই সঙ্গে ছবিটির রহস্যময়তারও দ্যোতক। চরিত্রটি গড়ে ওঠে আলেকজাণ্ডারের সমান্তরালে, অর্থাৎ পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের পরিভাষায় যেটিকে বলা হয় 'কাউন্টারপয়েন্ট'। এই অটোই নীট্‌ৎশে-প্রণীত 'জরাথুস্ত্রের বাণী'তে উল্লেখিত বামনের কথা বলে, যে বামন প্রাজ্ঞ জরাথুস্ত্রকে পরাভূত করেছিল। এই উপাখ্যানটি বইটির 'স্বপ্ন ও হেঁয়ালি' পরিচ্ছেদে রয়েছে। বামন জরাথুস্ত্রকে বলছে, 'কোন সত্যের পথই সরল নয়; সময় আসলে বৃত্তাকার' সৃষ্টি বার বার নিজেকে পুনরাবৃত্ত করে, প্রতিবারই রহস্যের আড়ালে স্ব-রূপকে লুকিয়ে রাখে। আমরা কেবল পারি বার বার এর সঙ্গে মিলতে, বার বার এর প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে। অন্যভাবে বলতে গেলে শিল্প সৃষ্টির অন্তিম লক্ষ্যও তাই। অটো আসলে হেঁয়ালির ছলে এই পরম সত্যের দিকেই ইঙ্গিত করে। আলেক-জাণ্ডার তো কথার ভারে ন্যুব্জ। 'কথা, কথা আর শুধু কথা, এখন আমি বুঝতে পারি হ্যামলেট কী বলতে চেয়েছিল'। অর্থাৎ কথা শেষ পর্যন্ত আত্মরতিমাত্র, আলেকজাণ্ডার ক্রমাগত আত্মার এই শব সাধনায় ক্লান্ত। অটোর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতকে সে তত্ত্বকথা বলেই ধরে। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আলেকজাণ্ডারের এক চরম সংকটের মুহূর্তের জন্য, এক অমোঘ 'বিস্ফোরণের' জন্য যা কবিতারই আরব্ধ কর্ম, স্বপ্ন বাস্তব যেখানে একাকার হয়, স্বপ্ন যেখানে এক দৈব প্রত্যাদেশের

ভূমিকা নেয়। অটোই এই 'বিস্ফোরণের' নিয়ন্তা।

ছবি শুরু হয় লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা 'অ্যাডোরেশন অফ দি মেজাই' তৈলচিত্রটি দিয়ে। 'মেজাই' অর্থ প্রাচ্যদেশের তিন প্রাজ্ঞপুরুষ যাঁরা বেথেলহেমে সদ্যোজাত যিশুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে এসেছিলেন। ছবিটির বিষয়বস্তু 'ন্যাটিভিটি' অর্থাৎ মানবত্রাতা যিশুর আবির্ভাব উপলক্ষে পালিত উৎসব। লিওনার্দোর এই চিত্রটি 'স্যাক্রিফাইস্' ছবির একটি প্রধান উপাদান। লিওনার্দো তাঁর এই ছবিতে 'ন্যাটিভিটির' থিমকে এক ব্যাপক অর্থ দিয়েছেন। গাছের নীচে যিশুকে কোলে নিয়ে মাতা মেরি উপবিষ্ট, যিশুর এক হাত প্রাজ্ঞপুরুষদের একজনের হাত থেকে পানপাত্র নিতে প্রসারিত, যিশুর পায়ে প্রণত যিশুর পিতা যোসেফ ও এক প্রাজ্ঞপুরুষ, মেরি ও যিশুর দু'পাশে অন্য দুইজন, মুখে তাদের বিষণ্ণতা, চারপাশে কোন এক রহস্যময় কারণে উত্তেজিত জনতা ও ত্রস্ত মেষপালকের দল, পেছনে আবছা আলোর পটভূমিতে যুধ্যমান কিছু অশ্বারোহীর অস্পষ্ট অবয়ব, বাঁ-পাশে এক বিধ্বস্ত প্রাসাদ যার সিঁড়ি দিয়ে কিছু ছায়ামূর্তি-সদৃশ মানুষ দ্রুত ওঠানামায় ব্যস্ত, প্রাসাদের চত্বরে অসম্পূর্ণ অবয়ব, অশরীরী মানুষ যেন তারা অন্ধকারের জগত থেকে সদ্য-নিষ্ক্রান্ত, গাছের পেছনে বন্য ঘোড়ার ক্রুদ্ধ আস্ফালন, প্রাসাদের সামনে অশ্বারূঢ় এক যোদ্ধা, বাঁ-পাশে ফ্রেমের নীচে দার্শনিক গভীর চিন্তায় মগ্ন, ডানপাশে ফ্রেমের নীচে এক সুন্দর যুবক, তার দৃষ্টি দৃশ্যটি থেকে অবজ্ঞায় অন্যদিকে ফেরান —এই সবের সন্নিবেশে গোটা ক্যানভাসব্যাপী এক আধো-অন্ধকার রহস্যময় স্বপ্ন-সদৃশ পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়। অশ্বের হ্রেষা, অস্ত্রের ঝংকার, ক্লিষ্ট মানুষের আর্তনাদে পৃথিবীতে এক অদ্ভুত আঁধার নেমে আসে—সভ্যতা যেন অন্তিম বিনাশের প্রতীক্ষায় থমকে দাঁড়িয়েছে। এই মুহূর্তে যিশুর আবির্ভাবে যে মুক্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছে, বিভ্রান্ত, ক্লিষ্ট মানুষ এর অর্থ বুঝতে পারে না, ফলে আতঙ্ক আর আশঙ্কা আলোড়িত। সুন্দর যুবকটি রেনেশাঁসের মানুষ, বুদ্ধি ও মননের প্রতিভূ। এই ঐশী ঘটনা তার কাছে নিতান্তই অবজ্ঞার বস্তু। এইভাবে 'ন্যাটিভিটির' থিমটির অভিনব ব্যাখ্যায় ছবিটি মানব সভ্যতারই এক চিত্রকল্প হয়ে দাঁড়ায়। এবং একই সঙ্গে 'স্যাক্রিফাইস্' ছবিটিরও। লিওনার্দোর তৈলচিত্রটির শটের সঙ্গে বাখের 'সাধু মথির প্যাশন' সঙ্গীতের প্রয়োগ এখানে বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে আসে। সঙ্গীতটি দৃশ্যবস্তুর 'কাউণ্টারপয়েণ্ট' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

'কাউণ্টারপয়েণ্টের' ধারণাটি জন্ম নেয় পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের বিবর্তনের

সাথে সাথে। অবশ্য চিত্রকলা, বিশেষত প্রাচীন মিশরীয় চিত্রকলায়, এর ব্যবহার দেখা যায়। প্রাচীন মিশরীয় দ্বি-মাত্রিক চিত্রে মানুষের মুখটি থাকে প্রোফাইলে আর চোখদুটো থাকে সামনে দর্শকের দিকে। অর্থাৎ একই বিষয়কে দু'ভাবে বলা হল এবং দু'টো ভঙ্গিই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি 'কাউন্টার-পয়েন্টের' প্রয়োগে ভিন্ন মাত্রা পায়। অন্যভাবে বলতে গেলে একটি মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়। সঙ্গীতে কাউন্টারপয়েন্ট সৃষ্টি হয় একাধিক স্বরের সম-উপস্থিতিতে। চলচ্চিত্রে এর ব্যবহার প্রায়শই হয়ে থাকে। খ্রীস্টীয় ধর্মে 'প্যাশন' কথাটি বলতে বোঝায় ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু। অর্থাৎ মানুষের পরিত্রাণের জন্য যিশুর আত্মত্যাগ। এর বিবরণ আমরা নিউ টেস্টামেন্টের চারটি মঙ্গল-সমাচারে পাই। এই মঙ্গল-সমাচারগুলিতে যিশুর জীবনের শেষ ক'দিনের যে ঘটনা বিবৃত রয়েছে সেটি ভিত্তি করে মধ্যযুগে 'প্যাশন প্লে' অভিনীত হত। 'প্যাশন-প্লে'-তে সঙ্গীতের ব্যবহার ছিল না বললেই চলে। 'প্যাশন সঙ্গীতের' জন্ম রোমান ক্যাথলিক গীর্জায়। অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে যিশুর জীবনকাহিনী ও তাঁর বাণী সহজ করে বোঝানর জন্য স্বর করে যীশুর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের আখ্যান শোনান হত। পিয়ানো যন্ত্রটি আসার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। স্বরের বিচিত্র ও জটিল রূপ প্রকাশের দ্বার খুলে যায়। প্যাশন সঙ্গীতেও এর প্রভাব পড়ে। বাখে এসে প্যাশন সঙ্গীতের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। বাখ যে পাঁচটি প্যাশন সঙ্গীত লিখেছিলেন তার মধ্যে দু'টি সঙ্গীত কেবল পাওয়া যায়। এই দু'টির মধ্যে 'সাধু মথির প্যাশন' সঙ্গীতটি স্বরের বৈচিত্র্যে ও ভাবের মাহাত্ম্যে বিশিষ্ট। এই ভাবে সোজা সরল আখ্যানটি ক্রমে এক জটিল রূপ নেয়। অর্থাৎ যেটি ছিল একান্তই লোকশিক্ষার সরল কাহিনী বাখের সঙ্গীতে সেটিই এক অনন্য আধ্যাত্মিক অনুভূতির ব্যঞ্জনা নিয়ে এল। যিশু উচ্চারিত প্রতিটি বাণী, তাঁর প্রতিটি কর্ম অর্থবহ হল। আমরা এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এক ইন্দ্রিয়াতীত মহাজগতের আভাস পেলাম।

লিওনার্দোর আঁকা ছবিটির সঙ্গে 'সাধু মথির প্যাশন' সঙ্গীতের ব্যবহার এক মিশ্র অনুভূতি সৃষ্টি করে। ছবিটিতে বর্ণিত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ বুদ্ধির ঔদ্ধত্য, নিপীড়িত মানুষের সংশয়—এই সবের মাঝখানে যীশু-জন্মের মহান বাণীটি মানুষের কাছে এখনও স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়নি। যদিও তারা অনুভব করে পৃথিবীতে এক অনন্য ঘটনা ঘটে গেছে। এই অনুভূতির সমান্তরালে আমরা

আরেকটি বিপরীত অনুভূতির আভাস পাই। সেটি হল প্যাশন সঙ্গীতে সৃষ্ট যিশু-জন্মের এক ঐশী বাণী। ধ্বংস, হিংসা, সংশয় ও বুদ্ধির বাইরে এক সৃষ্টিশীল বিশ্বের উপস্থিতি আমাদের সমগ্র সত্তাকে আলোড়িত করে। পরস্পরবিরোধী সুরের এই 'পলিফনি' বস্তুত 'স্যাক্রিফাইস্' ছবিটিরই মুখবন্ধ। আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে জরুরী। 'পলিফনিটি' ব্যবহৃত হয়েছে ছবিটির পাঠবস্তুর অঙ্গ হিসাবে। মূল কাহিনীর সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগ নেই যদিও তথাকথিত কাহিনী, অর্থাৎ ঘটনার ক্রমবিকাশ, যুক্তিগ্রাহ্য চরিত্রচিত্রণ ইত্যাদি বলতে এখানে কিছু থাকেনা। ঘটনাগুলির সঙ্গে এটি কবিতার মতই বিষয়ীগত অনুষঙ্গে যুক্ত হয়ে গড়ে তোলে ছবিটির মূল সুর।

জেমস জয়েস তাঁর 'ইউলিসিস্' উপন্যাস লিখতে শুরু করেন ১৯১৪ সালে। আর এই বছরেই তৈরি হয় গ্রিফিথের 'বার্থ অব্ এ ন্যাশন' ছবি। সালটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ উপন্যাস যখন এরই মধ্যে মনোজগতের গভীরে অনায়াসে বিচরণ করছে চলচ্চিত্র তখন সবেমাত্র গল্প বলার সরল রীতিটি আয়ত্ত করতে ব্যস্ত। ১৯২৫ সালে তৈরি হয় 'ব্যাটেলশিপ পটেমকিন', ১৯৩৯-এ রেনোয়ার 'রুলস অফ দি গেম', ১৯৪১-এ ওয়েলসের 'সিটিজেন কেইন', ১৯৪৮-এ ডি সিকার 'বাইসাইকেল থিফ', ১৯৫০-এ কুরোশোয়ার 'রশোমন', ১৯৫৫-তে 'পথের পাঁচালি', ১৯৫৬-তে বার্গম্যানের 'সেভেন্থ সীল', ১৯৫৯-এ বুনুয়েলের 'নাজারিন' ও গোদারের 'ব্রেথ্‌লেস'—এই অবিশ্বাস্য কম সময়ের মধ্যে চলচ্চিত্র তার গল্প বলার শৈশব অবস্থা কাটিয়ে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পমাধ্যমে পরিণত হয়। যে কোন শিল্পমাধ্যমই ভাষার মর্যাদা পায় তার চিন্তার প্রকাশ ক্ষমতায়। এই অর্থে চলচ্চিত্র পুরোপুরিই একটি ভাষা। প্রকাশ ক্ষমতায় চলচ্চিত্র এখন আধুনিকতম উপন্যাস ও যে কোন মননশীল প্রবন্ধের সমকক্ষ, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের মতোই বাস্তবের বিমূর্ত রূপ-নির্মাণে সমান দক্ষ। ১৯৪৮ সালে চলচ্চিত্র পরিচালক আলেকজাঁদ্র আস্ত্রুক তাঁর 'কামেরা-স্তিলো' তত্ত্বে চলচ্চিত্রের এই চিন্তা-প্রকাশের বিশেষ ক্ষমতাটিকেই চলচ্চিত্রের এক এবং একমাত্র ধর্ম বলে চিহ্নিত করেন। ক্যামেরা শুধু দৃশ্যগ্রাহক যন্ত্র নয়, কলমের মতোই হবে তার স্বচ্ছন্দ গতি। কেবল দৃশ্য ও শ্রাব্যবস্তুর দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে চলচ্চিত্র হবে লিখিত ভাষার মতই সূক্ষ্ম ও সাবলীল। এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি, সত্যিকারের চলচ্চিত্র এই অর্থে আদৌ অডিও-ভিশুয়াল আর্ট নয়। অর্থাৎ চলচ্চিত্র-সমালোচক জঁ অঁাদ্রে ফিয়েশ্চি তথাকথিত যে সব চলচ্চিত্রকে 'টু কোলাম সিনেমা'—এক সারণীতে দৃশ্যবস্তু, অন্য সারণীটিতে সংলাপ, আবহসঙ্গীত, ধ্বনি

ইত্যাদি—বলে আখ্যা দিয়েছেন সেগুলি প্রকৃত অর্থে চলচ্চিত্র অভিধা পায়না। 'স্যাক্রিফাইস্' ছবির আলোচনায় চলচ্চিত্রের এই সংক্ষিপ্ত পটভূমি বর্ণনার প্রাসঙ্গিকতা এই যে চলচ্চিত্র অডিও-ভিশুয়াল আর্ট এই ধারণাটি তারকোভস্কির ছবি এবং বিশেষ করে আলোচ্য ছবিটি নস্যাৎ করে দেয়। অবশ্য চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই জাতীয় দৃষ্টান্ত বেশ কিছু রয়েছে। তবে তারকোভস্কির ধারাটি একেবারেই স্বতন্ত্র। একথা বলা বাহুল্য যে ছবিতে দৃশ্য ও শ্রাব্য দুটো উপাদানই থাকে। তবে কীভাবে থাকবে সবটাই নির্ধারিত হয় ঐ বিশেষ ছবির চিন্তার বিন্যাসের ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী। আমরা শুরুতেই আলোচনা করেছি তারকোভস্কির ছবির মূল সূত্রটি। এবার 'স্যাক্রিফাইস' ছবিটির ক্ষেত্রে এর পুনরুত্থাপন প্রয়োজন।

ছবির দ্বিতীয় শটে আমরা দেখি এক বিমূর্ত নিসর্গচিত্র। বিমূর্ত, যেহেতু বিশাল সবুজ প্রান্তর, সমুদ্র সব মিলিয়ে দৃশ্যটি পৃথিবীরই চিরন্তন রূপ, আলেকজাণ্ডারের মুখে এটি একটি দ্বীপ, এ ছাড়া কোন স্থানের সঠিক হদিশ মেলে না, আবার কালেরও নয়, কারণ ছবিটি যে ভাবে এগিয়ে আবার শেষ শটে একই দৃশ্যে ফিরে এসেছে, সত্যতার একটি অন্তহীন প্রক্রিয়াই এতে প্রকাশ পায়। আবার অন্য অর্থে দৃশ্যটি বিশেষ স্থান-কালেরও নির্দেশ দেয় এই অর্থে যে ছবিটির মুখ্য চরিত্র আলেকজাণ্ডারের আত্মিক সঙ্কটের জন্ম এই বিংশ শতাব্দীর ভোগ-বাদী সমাজের গর্ভেই। অর্থাৎ চিত্রকল্পের ব্যাপ্তি গড়ে ওঠে বাস্তবের যথাযথ পরিবেশনেই। আমরা একটি মন্দিরকে আঁকছি। একটি দিনের আবর্তনে, দৃষ্টিকোণের তফাতে এর বিচিত্ররূপ দেখা যায়। প্রতিটি রূপই আবার মন্দিরের বহিরঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলির টানে প্রকাশ পায়। অথচ মন্দিরের একটা বিমূর্ত ধারণা তৈরি হয়ে যায় যা আপাতদৃশ্য বাস্তবকে ক্রমাগত 'ধ্বংস' করে। ছবিতে দীর্ঘ সময় ধরে 'বিস্তার'-পর্বের দৃশ্যগুলি একইভাবে বিমূর্ত রূপ পায়। গোটা ব্যাপারটিই কি বাস্তবে ঘটেছে, না আলেকজাণ্ডারের স্বপ্ন অথবা দুঃস্বপ্ন, আলেক-জাণ্ডারের সন্তান 'ছোট্ট মানুষটি'র স্বপ্ন না অটোর দ্বারা সংঘটিত কোন অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ—এসবের কোন ইঙ্গিতই পরিচালক আমাদের দেননি। কারণ ছবিটির বিষয়সত্বার বিকাশে এ ধরণের কার্যকারণ সম্পর্কিত প্রশ্ন অর্থহীন। বিষয়টি আমরা অন্যভাবেও ভাবতে পারি। ছবিতে প্রকৃত অর্থে দু'টো ঘটনাই ঘটেছে—প্রথম দৃশ্যে পিতাপুত্র দ্বারা মৃত, নিষ্পত্র গাছে জলদান, আবার শেষ দৃশ্যেও এই একই কার্যের পুনরাবৃত্তি, অবশ্য এবার শুধু পুত্রটিই থাকে। মাঝের দৃশ্যগুলি দুটো ঘটনাকে ধরে রাখে কেবল পরিচালকের চিন্তার বিমূর্ত অভিক্ষেপ

হিসাবে, একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে। ছবিতে 'ছোট্ট মানুষটি' অপারেশানের পর তার বাক্‌শক্তি ফিরে পায়। আদিতে বাণী থাকার সেই ঐতিহাসিক সংলাপটি বলে।

এর আগেই ঘটে গেছে আলেকজাণ্ডার দ্বারা সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড এবং তার মৌনব্রত পালনের প্রতিজ্ঞা। আলেকজাণ্ডারের পুত্রের মুখে উপরোক্ত সংলাপটিতেই থাকে বৃত্তটি সম্পূর্ণ করার প্রক্রিয়া।

ছবিটিতে ধ্বনি প্রয়োগের প্রশ্নে প্রথমেই মেষপালকের রহস্যময় ডাকটির কথা ভাবা যাক। শব্দটি আমরা ছবিতে অনেকবারই শুনি। আমরা পর্দায় সারাক্ষণ যা দেখি সেগুলির সঙ্গে শব্দটির কোন বস্তুগত যোগসূত্র খুঁজে পাই না। ছবিতে কোন সময়েই আমরা মেষপালকের দল দেখি না। আবার ছবির ঘটনাবলী যে স্থানে ঘটে সেখানে মেষপালক থাকার কোন প্রশ্ন নেই। অথচ শব্দটি ছবির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যবহৃত অন্য শব্দগুলি সম্পর্কেও প্রায় একই কথা বলা যায়। 'সাধু মথির প্যাশন' সঙ্গীতটি ছাড়া আরও আবহ সঙ্গীত ব্যবহৃত হয়েছে—জাপানি সাকুহাচি বাঁশি এবং অর্গানে একটি প্রেলুড পিস।

ছবিতে সংলাপের ভূমিকা বলতে আমরা সাধারণত বুঝি মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিশ্বস্ত চরিত্রচিত্রণ এবং কাহিনীকে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। 'স্যাক্রিফাইস্' ছবিতে সংলাপের এ-জাতীয় কোন ব্যবহার দেখা যায় না। প্রথমে চরিত্রচিত্রণের বিষয়টি ধরা যাক।

আলেকজাণ্ডার ছিল মঞ্চের প্রখ্যাত অভিনেতা। অর্থ ও খ্যাতির আবর্তে সে ক্লান্ত হয়। মঞ্চ ছেড়ে এই নির্জন দ্বীপে বসবাস করতে থাকে। ইতিহাসের প্রাক্তন শিক্ষক অটো এখন অবসর সময়ে চিঠি বিলি করে। আলেকজাণ্ডারের স্ত্রী আদেলেইদ অর্থ ও খ্যাতির আকর্ষণেই আলেকজাণ্ডারকে বিয়ে করে। সংলাপে এ জাতীয় কিছু তথ্য ছাড়া আর বিশেষ কিছুই থাকে না। চরিত্র দুটি তাদের বর্তমান মানসিক অবস্থা নিয়েই আমাদের কাছে উপস্থিত। এ ব্যাপারে দস্তয়ভস্কির চরিত্রায়ণের পদ্ধতির সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। অন্যান্য বাস্তববাদী লেখকদের মতো দস্তয়ভস্কি কখনই কোন চরিত্রকে ব্যাখ্যা করেন না। চরিত্রটি ইতিমধ্যেই পূর্ণতা পেয়েছে এমন একটা অবস্থান থেকে লেখকের অন্বেষা শুরু হয়। অটোর সংলাপ তার রহস্যময়তাকেই বেশি ব্যক্ত করে। তার হেঁয়ালিপূর্ণ কথায় একটি বাস্তব চরিত্রের রূপ থেকে বরং একটি অলৌকিক 'মোটিফের' সাদৃশ্যই বেশি ধরা পড়ে। যেমন, যেখানে অটো আদেলেইদ,

আলেকজাণ্ডারের ডাক্তার বন্ধু ভিক্তর ও কন্যা মার্তার কাছে একটি 'ঘটনার' কথা শোনায়। ঘটনাটি এরকম। যুদ্ধে জনৈক মার একমাত্র সন্তান মারা যায়। যুদ্ধে যাওয়ার আগে মা ও ছেলের একটি ছবি তোলা হয়েছিল। এরপর দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কেটে যায়। মার কাছে পুত্রের স্মৃতি ম্লান হয়ে আসে। এই সময়ে ঘটে আশ্চর্য এক ঘটনা। মৃত সন্তানের মা আবিষ্কার করে ঐ ছবিটি। ছবিটিতে যুবকটির যুদ্ধে যাওয়ার আগের চেহারাটিই আছে, কেবল মার চেহারাটিই অবিকল কুড়ি বছর আগের। অটো এখানে স্মৃতির অমোঘ প্রক্রিয়া, স্মৃতির আকস্মিক 'বিস্ফোরণের' কথাই বলছে এবং এই অর্থেই ঘটনাটি 'অলৌকিক'। রহস্যময়ী পরিচারিকা মারিয়া, কন্যা মার্তা এবং এবং পরিচারিকা জুলিয়ার বস্তুত কোন সংলাপই নেই।

আধুনিক চলচ্চিত্রে প্লট ব্যাপারটি কার্যত উঠে গেছে। একটা কাহিনী বলতে আমরা যা বুঝি, অর্থাৎ কাহিনীটির একটা শুরু, তার বিস্তারপর্ব এবং সমাপ্তি, সেটিও খুব প্রচলিত নয়। গোদার তো কাহিনা ব্যাপারটিকেই তাঁর ছবি থেকে বর্জন করেছেন। গোদার তাঁর ছবিকে একটা প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করতে বেশি মনস্ক। তারকোভস্কিও কাহিনী বলায় উৎসাহী নন। তবে গোদার থেকে তাঁর ধারাটি ভিন্ন। গোদারের পদ্ধতি অনেকটা বিজ্ঞানীর বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়ার মতো। গোদার একটা কেন্দ্রীয় চিন্তাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে নানা দিক থেকে এর বিশ্লেষণ করেন, এমনকি চিন্তাটির বৈধতাকেই প্রশ্ন করেন, অর্থাৎ প্রধানত আমাদের মননকে আহ্বান জানান সমস্যাটি বুঝতে। তারকোভস্কির ছবিতে মননের ভূমিকা থাকে পশ্চাতে। তাঁর ছবির কেন্দ্রীয় চিন্তাটি মূলত বিষয়ীগত অনুষঙ্গে গড়ে ওঠে, চিন্তাটি ক্রমে বিভিন্ন স্তরের সন্নিবেশে একটা অখণ্ড রূপ নেয় যাকে কোন সরল উপপাদ্যে রূপান্তরিত করা যায় না। গঠনটি অনেকটা স্থাপত্যের মতো, কোন একটি অংশকে বাদ দিলে গোটা কাঠামোটাই ভেঙে পরে। 'স্যাক্রিফাইস' ছবিতে সংলাপ এই স্থাপত্যের একটি অঙ্গ মাত্র। 'ন্যারেটিভ'-কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সংলাপের ভূমিকা ততটাই যতটা এই ন্যারেটিভটির অগ্রগতি ওই স্থাপত্যকেই গড়তে সাহায্য করে।

ছবিটিতে দৃশ্য ও শ্রাব্য বস্তু তাদের বস্তুগত ভিত্তি থেকে সরে গিয়ে বিষয়ীগত সম্পর্কের এক পূর্ণাঙ্গ শরীর তৈরি করে। কীভাবে এই কাণ্ডটি ঘটে? কবিতার প্রসঙ্গ এখানে অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। অবশ্যই বানান করে এই গঠন-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না, কবিতার গঠনের সঙ্গে এর একে-একে-দুই এই

সম্পর্ক স্থাপনও করা যায় না।

জাপানি চিত্রাঙ্কনের একটা বিশেষ রীতি আছে। ধরুন একটি গাছ আঁকা হচ্ছে। চিত্রকরের তুলি বা কলমের টান থাকে নীচ থেকে ওপরে, অর্থাৎ যে ভাবে গাছটি বীজ থেকে জন্ম নেয় এবং কাণ্ড বেয়ে ক্রমে শাখাপ্রশাখা, পত্রপুষ্প নিয়ে আকাশে প্রসারিত হয়। 'স্যাক্রিফাইস' ছবিটির ক্ষেত্রেও এমন একটা পদ্ধতি দেখা যায়। প্রথম শটের শেষভাগে ক্যামেরা লিওনার্দোর ছবির গাছটিকে ধরে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যায়। শেষ শটেও ক্যামেরার অনুরূপ মুভ্‌মেণ্ট দেখা যায়, তবে মুভ্‌মেণ্টটি এবার মৃত, নিষ্পত্র গাছটিকে ধরে ঘটে। গাছটির কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। প্রথম শটে যে সঙ্গীত ব্যবহৃত হয় সেটা শেষ শটেও আমরা শুনতে পাই। প্রথম শটে সঙ্গীতটি ছবির মূল সুরেরই পূর্বঘোষণা করে এবং শেষ শটে সুরটি পরিপূর্ণ রূপ পায়। এভাবে দুটো শটের মধ্যে বিষয়ীগত ঐক্য তৈরি হয়। বিশদে বলতে গেলে, সমস্যাটি এই পৃথিবীর, সমাধান পায় সৃষ্টির পথ ধরে যেমন করে গাছটি বেড়ে ওঠে, বিশাল পৃথিবীর সঙ্গে গাছটির একটা জৈবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অন্যভাবেও বিষয়টি ভাবা যায়। শেষ শটে সঙ্গীত ক্যামেরা মুভ্‌মেণ্টের পুনরাবৃত্তি একটা ধুয়া (রিফ্রেইন) হিসাবে কাজ করে। এই রকম ধুয়ার ব্যবহার কবিতায় প্রায়শই হয়ে থাকে। এ ধরনের ধুয়ার ব্যবহারে আমরা প্রাথমিক অনুভূতিতে ফিরে যেতে পারি। ফলে ঐ অনুভূতিটি গভীরতর ব্যঞ্জনা পায়।

প্রথম শটের শেষ-অংশে আমরা সঙ্গীতের সঙ্গে সমুদ্র শকুনের ডাক, ফগহর্ণের শব্দ ও সমুদ্রের অস্ফুট গর্জন শুনতে পাই এবং অব্যবহিত পরেই শটের পরিবর্তন হয়। আমাদের সামনে এক বিশাল নিসর্গ-দৃশ্য উন্মোচিত হয়। উপরোক্ত শব্দগুলি দৃশ্যটির পটভূমি তৈরি করে।

পটভূমিটি এইরকম—যেন আদি ও অনন্ত পৃথিবীতে একটি চিরন্তন নাটক ঘটতে চলেছে। শুধু মঞ্চটিই নেই, গোটা পৃথিবীই এখানে একটি মঞ্চ যেন। তিনটি মূল চরিত্র আলেকজাণ্ডার, অটো ও আলেকজাণ্ডারের পুত্রকে এই নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা হয়। লক্ষণীয়, এই দিনটি আলেকজাণ্ডারের জন্মদিন। মৃত, নিষ্পত্র গাছে জল দিতে দিতে আলেকজাণ্ডার তার ছেলেকে একটি উপাখ্যান শোনায়। প্রাচীনকালে কোন এক মঠের নবীন সন্ন্যাসী তার তার গুরুর আদেশে রোজ পাহাড় বেয়ে উঠত এবং পাহাড়ের চূড়ায় একটি মৃত গাছে জল দিত।

দীর্ঘ তিন বৎসর পর গাছটি পত্র-পুষ্পে পল্লবিত হয়। এই উপাখ্যানে ছবির

একটি মূল 'মোটিফ' নিহিত থাকে। 'মোটিফ'-টি হল মিলনের—মৃত গাছে প্রাণ-সঞ্চারের এই প্রলম্বিত, নিরলস সাধনায় আমাদের সমগ্র সত্তাটিই জড়িয়ে থাকে এবং এই ভাবে আমরা বিশ্বের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সঙ্গে একটি জৈবিক সম্পর্ক স্থাপন করি। 'মোটিফ'-টির পুরো ব্যঞ্জনা অবশ্য এখানে থাকে না।

ছবির প্রতিটি দৃশ্য প্রত্যক্ষ বাস্তবের যথাযথ চিত্ররূপ, প্রতিটি দৃশ্যই তোলা হয় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে। এখানে আলাদা করে কোন অর্থ থাকে না, কোন প্রতীকের ব্যবহারও হয় না। তারকোভস্কির চিন্তায় প্রতীকের ব্যবহার বস্তুত শিল্প-সৃষ্টির পরিপন্থী। অর্থ তৈরি হয় দৃশ্যের পরম্পরায়। একটি দৃশ্য অর্থবহ হয়ে ওঠে দৃশ্যটির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দৃশ্যগুলির সন্নিধি (Juxtaposition)-তে। দৃশ্যগুলি ক্রমাগত এগিয়ে গিয়ে ফিরে আসার প্রক্রিয়াতেই একটি বিশেষ দৃশ্যে বিভিন্ন স্তর বিন্যস্ত হয়। আমরা ছবির দৃশ্যগুলির একটি বিমূর্ত রূপের কথা আগেই বলেছি। এই বিমূর্ত রূপ সৃষ্টি হয় উপরোক্ত ওই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই। একটি দৃশ্যের কথা ভাবা যাক যেখানে উচ্ছিষ্ট বস্তু ও জল-কাদার ওপর দিয়ে ক্যামেরা 'মুভ্' করে। জল-কাদার ওপর কিছু মুদ্রা ছড়ানো-ছিটানো থাকে। তারকোভস্কিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি কেন ওই মুদ্রাগুলি ছড়িয়ে রেখেছেন। উত্তরে তারকোভস্কি বলেন, আমি ঠিক জানিনা, কী করে জানব! 'নগ্ন নির্জন হাত' কথাটির মতোই এরও কোন আক্ষরিক অর্থ হয় না, যেহেতু গোটা ছবিটি একটি জৈবিক শরীর-বিশেষ এবং উপরোক্ত দৃশ্যটি এই শরীর জড়িয়েই থাকে। তিনি আলাদা করে মুদ্রা নিয়ে ভাবেননি, মুদ্রা এসে গেছে।

পরবর্তী তিনটি শটে আমরা আলেকজাণ্ডারের আত্মিক সঙ্কটের স্বরূপটি জানতে পারি। তার সঙ্কটটি সভ্যতারই সংকট। একদিকে যন্ত্রসভ্যতার অপ্রতিরোধ্য জয়যাত্রা, অন্যদিকে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের দ্রুত অবক্ষয়, ফলে মানুষ খণ্ডিত, নিরালম্ব। আলেকজাণ্ডার এই অসহ্য নির্জনতা সহ্য করতে পারে না, অনর্গল স্বগতোক্তিতে মুক্তি খোঁজে। এর পরেই দেখি আলেকজাণ্ডারের জ্ঞান হারানোর দৃশ্য এবং অব্যবহিত পরের সাদা-কালো শটে একটি বিধ্বস্ত রাস্তা, আতঙ্কিত, বিভ্রান্ত মানুষ ছোটাছুটি করে, যেন দুঃস্বপ্নের এক প্রতিচ্ছবি। মেষপালকের রহস্যময় ডাকটি ভেসে আসে। ধ্বনিটি আমরা এর আগে একবার শুনতে পাই যখন আলেকজাণ্ডার তার পুত্রকে প্রাচীন উপাখ্যানটি শোনায়। এছাড়া আরও ছ'টি দৃশ্যে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। দৃশ্যগুলি হল—'অলৌকিক ঘটনা'-টি শোনানোর পর অটো এক অদৃশ্য আঘাতে মেঝেতে পড়ে যায়; আলেকজাণ্ডার ঈশ্বরের কাছে শপথ করে, সে তার স্ত্রী-পুত্রকন্যা,

পার্থিব সম্পদ সবই ত্যাগ করবে যদি তিনি পৃথিবীকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন ; অটো মারিয়ার কাছে যাওয়ার জন্য আলেকজাণ্ডারকে কার্যত বাধ্য করে, কারণ সে জানে মারিয়ার সঙ্গে মিলনে আলেকজাণ্ডারের পরিত্রাণ এবং সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতিরও ; মারিয়ার বাড়িতে যাওয়ার পথে আলেকজাণ্ডার সংশয়ান্বিত হয় ; আলেকজাণ্ডার মারিয়ার বাড়িতে নিজের কপালে পিস্তল ঠেকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বোমারু বিমানের গর্জনে সমস্ত পৃথিবী যেন কেঁপে ওঠে এবং আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে মারিয়ার মিলনের অলৌকিক দৃশ্যটির পর ক্যামেরা বিধ্বস্ত রাস্তার দৃশ্য থেকে পেছনে ফিরে কাচের স্তম্ভে প্রতিফলিত অট্টালিকার দৃশ্য ধরে, ক্যামেরা আরও পিছিয়ে গেলে আমরা আলেকজাণ্ডারের নিদ্রিত পুত্রকে দেখি। পর্দায় এরপর দ্রুত কিছু দৃশ্য ফুটে ওঠে, যেমন, আদেলেইদ ঘাসের উপর ঘুমন্ত আলেকজাণ্ডারের পাশে বসে আছে, লিওনার্দোর ছবিটি এবং নগ্ন মার্তা বাড়ির বারান্দা থেকে মুরগির দল তাড়ায়। শব্দটি শুধু দৃশ্যগুলির 'কাউন্টার পয়েন্ট' হিসাবেই ব্যবহৃত হয়নি, প্রতিবারই শব্দটি এই শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত আগের ও পরের দৃশ্যগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি 'অলৌকিক' ব্যঞ্জনা আনে। 'অলৌকিক' এই অর্থে যে এই শব্দের সঙ্গে যুক্ত প্রথম দৃশ্যে আলেকজাণ্ডার বর্ণিত প্রাচীন উপাখ্যানটিতে যে সাধনার কথা থাকে তার পরিণতি ঘটে একমাত্র একটি শাশ্বত জৈবিক সম্পর্ক স্থাপনেই, মননের পথে কখনই নয়। মেষপালকের ডাকের পরিপ্রেক্ষিতে বাইবেলের একটি ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যিশুর জন্মের বার্তা মেষপালকরাই প্রথম দেবদূতের মাধ্যমে জানত পারে। অর্থাৎ মেষপালকের ডাকের মধ্যে দিয়ে যেন ঈশ্বরের কণ্ঠই আমরা শুনি। ঈশ্বর অর্থে আমরা এখানে একটি চিরন্তন সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কথাই বুঝি। যদিও আমরা জানি তারকোভস্কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

ছবিতে ব্যবহৃত ধ্বনিগুলির বিন্যাস একটি বিষয়ীগত কার্যসিদ্ধি করে। তারকোভস্কি মনে করতেন, আমাদের এই দৃশ্যমান জগত এমনিতেই এত ধ্বনিময় যে ছবির জন্য আলাদা করে সঙ্গীত রচনা না করলেও চলে। কিন্তু এই শব্দগুলি তো আসলে বোধের জগতেরই যেখানে সময়ের কোন পরম্পরা নেই, নেই বাস্তব আর স্বপ্নের ভেদরেখা। এই সূত্রের ভিত্তিতেই 'স্যাক্রিফাইস' ছবির শব্দগুলি সংগঠিত হয়েছে।

এইভাবে ছবিটি দৃশ্যের পর দৃশ্যকে গেঁথে নিয়ে বিলম্বিত লয়ে চলে। আলেকজাণ্ডারের জন্মদিনে অটো তাকে সপ্তদশ শতাব্দীর ইয়োরোপের একটি মানচিত্র উপহার দেয়। আলেকজাণ্ডার মানচিত্রটি দেখে মুগ্ধ হয়, কিন্তু এটি

তো ইয়োরোপের ভূগোলের সঠিক চিত্র দেয়না, সে বলে। কথাটি স্বীকার করে নিয়ে অটো বলে, কিন্তু মানুষ তো তখনও বাঁচত এবং খুব একটা খারাপভাবে নয় নিশ্চয়। অর্থাৎ জ্ঞানের মানচিত্রে জীবনের পুরোপুরি প্রতিফলন কোনদিনই ঘটে না। এর পরেই আসে অটো কর্তৃক 'অলৌকিক' ঘটনাটির বিবরণ এবং বজ্রপাত ও বোমারু বিমানের পৃথিবী কাঁপানো শব্দ ও মেষপালকের ডাক।

আলোচনার এই পর্বে ছবিটির চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা পদ্ধতির কথা বলা জরুরি হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে আইজেনস্টাইনের 'মন্তাজ' পদ্ধতি এবং চলচিত্র সমালোচক আঁদ্রে বাজ্যাঁর 'সিকোয়েন্স শট' ও 'ডিপ ফোকাস' ব্যবহারের দর্শনটির কথা বলতে হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বাজ্যাঁ মনে করতেন 'মন্তাজ' রীতিটি বস্তুত মননের কসরত এবং এর দ্বারা বাস্তবের বিচিত্র ও দ্ব্যর্থবোধক রূপের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটে না। 'মন্তাজ'-এর লক্ষ্য মূলত বাস্তবের একটি মননজাত নক্শা গঠন, 'সিকোয়েন্স শট' এবং 'ডিপ ফোকাস্'-এর প্রয়োগে একটি দৃশ্যের স্থান-কাল এবং নাটকের ঐক্য বজায় থাকে, উপরন্তু বাস্তবকে তার স্ব-রূপে ধরা যায়। এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। আমরা এই তর্ক-বিতর্কে না গিয়ে বলতে পারি চলচ্চিত্র ভাষার ক্ষেত্রে এই দুটি পদ্ধতিই অপরিহার্য এবং এই কথাটি আধুনিক অনেক পরিচালকের ছবিতে প্রমাণিত হয়েছে। তারকোভস্কি আইজেনস্টাইনের 'মন্তাজ' পদ্ধতির বিরোধী। এই পছন্দ, অপছন্দের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে শিল্পী আসলে কী করতে চাইছেন, তাঁর দর্শনটাই বা কী এ সবের উপর। 'স্যাক্রিফাইস' ছবিতে তারকোভস্কি যে জগত সৃষ্টি করতে মগ্ন সেই সৃষ্টিকর্মে মননের থেকে স্বজ্ঞা ও অনুভূতির ভূমিকা অনেক বেশি। ফলত শিল্পী তাঁর সৃষ্টি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন এবং আমাদের আহ্বান জানান এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় নিজের মতো করে যুক্ত হতে। ছবিতে ঘটনাগুলি কেন ও কী ভাবে ঘটে এই সবের কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য সূত্র পরিচালক আমাদের দেন না।
অর্থাৎ পরিচালক তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনাকে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেন না। আবার প্রচলিত ছবির যেগুলি প্রধান উপাদান, যেমন, মেলোড্রামা, ঘটনার চমক, নাটকীয় সংঘাত, সেগুলিও তিনি সযত্নে এড়িয়ে যান। ফলত এই ছবিতে সম্পাদনার ভূমিকা হল দৃশ্যগুলিকে পরপর সাজিয়ে নিয়ে একটি সম্পূর্ণ চিত্র নির্মাণ করা, যেমন করে একটি কবিতা বা একটি স্থাপত্য নির্মিত হয়। অবশ্যই চিত্রগ্রহণের রীতি এই নির্মাণকার্যের পূর্ববর্তী ভূমিকাটি পালন করে। ছবিতে

'সিকোয়েন্স শট' ও 'লং টেক'-এর ব্যবহারই বেশি হয়েছে।

এই জাতীয় শটগুলি কার্যত একটি দৃশ্যের প্রকৃত স্থান-কালের ধারণাটি অটুট রাখে। 'মন্তাজ' ওই দৃশ্যটিকেই টুকরো-টুকরো করে ভেঙে ফেলে স্থান-কালের একটি বিমূর্তরূপ তৈরি করে। 'স্যাক্রিফাইস' ছবিতে চিত্রকল্পের বিমূর্তরূপ আসে বাস্তবকে যথাযথ সম্মান জানিয়েই। ফলে ছবিতে কালরাত্রির দুঃস্বপ্নের দীর্ঘ সিকোয়েন্সটি আসে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই। সিকোয়েন্সটি স্বপ্ন না বাস্তব, দুঃস্বপ্ন নাকি অলৌকিক কোন কার্যকলাপ এইসবের ব্যাখ্যা তারকোভস্কি দর্শকের কাছে রাখেন না।

পৃথিবীর সব রঙ মুছে যায়। গোধুলির আলোয় অপস্রিয়মান মারিয়ার দিকে আলেকজাণ্ডার চেয়ে থাকে। সেই মুহূর্তে ফগহর্নের দূরাগত শব্দ ভেসে আসে, উন্মোচিত হয় নাটকের আরেকটি অঙ্ক যে নাটকটির আরম্ভ ছবির প্রথম দৃশ্যে। এর আগে যা-যা ঘটে সেগুলি প্রস্তুতিপর্বমাত্র। এই সিকোয়েন্সের একটি জায়গায় আলেকজাণ্ডার বলছে, অভিনেতার কাজ নয় তার অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে মিলেমিশে যাওয়া, চরিত্রটিকে 'ব্যাখ্যা' করাতেই তার ভূমিকাটি যথাযথ পালিত হয় এবং এইভাবেই চরিত্রটি অনেক বেশি বাস্তবানুগ হয়, নাটকের বিষয়বস্তুও গভীরতর ব্যঞ্জনা পায়। আলেকজাণ্ডার তো অভিনেতা। সে একসময় 'রিচার্ড দি থার্ড'-এ রিচার্ড ও 'ইডিয়ট'-এ প্রিন্স মিশ্‌কিনের চরিত্রটি অভিনয় করত। আর এই ছবিতে সে 'আলেকজাণ্ডার'-এর চরিত্রটিকেই যেন 'ব্যাখ্যা' করবে। একদিক থেকে ছবিটির কেন্দ্রীয় সমস্যাটিকে আমরা আলেকজাণ্ডারের চিন্তার অভিক্ষেপ হিসাবেই ভাবতে পারি। এই 'ব্যাখ্যা'-র প্রক্রিয়ায় তো আমরা সমস্যাটির সঙ্গেই অনেক বেশি সংলগ্ন হই।

পৃথিবীর সব রঙ মুছে যায় (দীর্ঘ সিকোয়েন্সটির পুরোটাই 'মনোক্রোমে' ধরা হয়েছে)। লিওনার্দোর 'অ্যাডোরেশন্ অফ দি মেজাই' ছবিটি অটোকে ভীত করে। নেমে আসে কালরাত্রি। শুরু হয় চরিত্রগুলির আত্ম-দর্শনের এক দীর্ঘ-প্রলম্বিত যন্ত্রণার পালা যা বস্তুত অবচেতন মনেরই অনিবার্য এক 'বিস্ফোরণ'। আলেকজাণ্ডার তো অনেক আগে থেকেই জানে এমন একটা কিছু ঘটতে চলেছে—ভোগবাদী সমাজ তার গর্ভেই জন্ম দেয় পৃথিবীর অন্তিম বিনাশের অবশ্যম্ভাবিতাকে। জাপানি সাকুহাচি বাঁশির সুরে এই অন্তিম ধ্বংসের শোকবার্তা ঘোষিত হয়।

সাকুহাচি বাঁশির সুরটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে প্রথাগতভাবেই, দৃশ্যের ভাবটিকে গভীরতর অনুরণন দিতে। এই বাঁশিটি পরিপূর্ণ রূপ পায় সপ্তদশ শতাব্দীর

শেষে 'কমুসো' নামক ভ্রাম্যমান বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হাতে। এই সন্ন্যাসীদের দলে বুদ্ধের ভক্তদের চাইতে 'রোনিন্', অর্থাৎ প্রভুহীন 'সামুরাই'-দের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। জাপানে তখন ঘোর দুঃসময়। সামন্তরাজাদের মধ্যে অন্তহীন সঙ্ঘর্ষে সমাজ ভেঙে পড়েছিল। প্রভু সামুরাইরা প্রতিহিংসায় মত্ত হয়ে ওঠে। সাকুহাচি বাঁশিবাদকের আড়ালে তারা বুদ্ধের উপাসনা থেকে তাদের প্রতিহিংসা ব্যক্ত করতেই বেশি ব্যস্ত থাকত। পটভূমিটি বর্ণনা করার প্রাসঙ্গিকতা এই যে, বাঁশির স্বরটি এখানে ওই দুঃসময়েরই অনুষঙ্গ নিয়ে আসে। সেই হানাহানি, ধ্বংস ও রক্তের অপচয়।

টেলিভিশনে বিশ্বযুদ্ধের সংবাদ ঘোষণার সঙ্গে আমরা সাকুহাচি বাঁশির বিলাপ শুনতে পাই। পৃথিবী এক সর্বগ্রাসী আণবিক ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। এই দুঃসংবাদ শেষ হওয়ার আগেই দ্বীপটি বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। আলেকজাণ্ডারের বাড়ি অন্ধকারে ডুবে যায়। এইভাবে ঘটনার যথাযথ এবং বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনায় আমরা বস্তুত এক 'অবিশ্বাস্য' জগতেই প্রবেশ করি এবং প্রক্রিয়াটি ঘটে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই। এই 'অবিশ্বাস্য জগত' আসলে আমাদের অবচেতন মনেরই জগত, বাস্তবের সঙ্গে এর সীমারেখা অতি ক্ষীণ। এই দীর্ঘ কালরাত্রি, আসন্ন ধ্বংসের এই শ্বাসরোধকারী প্রতীক্ষা সীমারেখাটিকে মুছে দেয়। এখন সব কিছুই ঘটতে পারে, সব কিছুই ঘটে কবিতার 'অযৌক্তিক' প্রক্রিয়ায়। ভিক্তর যন্ত্রণাবিদ্ধ আদেলেইদকে ইনজেক্‌শন্ দেয়। আদেলেইদের আর্তচিৎকারই প্রথম ওই শ্বাসরোধকারী নৈঃশব্দকে বিদীর্ণ করে। সে এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায়। ভিক্তরের ইনজেক্‌শন্ যেন জাদু-ঔষধ এর কাজ করে। কারণ এখন কোন কিছুই আর অসম্ভব নয়, সবকিছুই এখন ঘটতে পারে। আদেলেইদের আত্ম-জিজ্ঞাসা শুরু হয়। অর্থ আর প্রতিষ্ঠার মোহে সে তার প্রেমিককে ত্যাগ করে আলেকজাণ্ডারকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু অবচেতন মনে স্মৃতি তার অমোঘ প্রক্রিয়াটি সক্রিয় রাখে। এখন এই অগ্ন্যুৎপাত। অনুতাপদগ্ধ আদেলেইদ জিজ্ঞাসা করে, কেন মানুষ তার প্রকৃত সত্তা নিয়ে আরেকটি মানুষের কাছে যেতে পারে না, কেন তার এই খণ্ডিত অস্তিত্ব। ভিক্তর মার্তাকেও ইনজেক্‌শন্ দেয়। মার্তা নগ্ন হয়, যেন বাহ্য সব বস্তুকে ছেড়ে সে তার শরীরের আদি শুদ্ধতায়, প্রকৃত সত্তায় নিজেকে সমর্পণ করে।

আলেকজাণ্ডার জানত, তার জিজ্ঞাসাতেই ছিল এই অন্তিম বিনাশের বীজ। এই যুদ্ধ অন্তিম যুদ্ধ। মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা সবকিছুই ধ্বংস হবে এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধের তাণ্ডবে। পৃথিবীতে প্রাণের আর কোন চিহ্নই থাকবে না।

আলেকজাণ্ডার দুঃসহ যন্ত্রণায় বিদীর্ণ। সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, ঈশ্বর যেন এই সমূহ বিনাশ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করেন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পার্থিব সম্পদ সব কিছুই সে পরিত্যাগ করবে যদি ঈশ্বর তার প্রার্থনায় সাড়া দেন। অটো তাকে মারিয়ার কাছে যেতে বলে। মারিয়া 'অলৌকিক' ক্ষমতাসম্পন্না এক নারী। এই নারীর সঙ্গে মিলনেই আলেকজাণ্ডারের প্রার্থনা সফল হতে পারে। মারিয়াই এখন মুক্তির একমাত্র উপায়, তার এবং মানুষেরও।

সংশয় নিয়ে আলেকজাণ্ডার মারিয়ার বাড়ির দিকে যাত্রা করে। দীর্ঘ এই পথ-পরিক্রমা। মারিয়া থাকে দ্বীপের এক প্রান্তে একটি গির্জায়। মারিয়ার বাড়ির সামনে ভেড়ার পাল ঘুরে বেড়ায়। খ্রিস্টীয় ধর্মে ভেড়ার সঙ্গে একটি পবিত্র, নিষ্পাপ ভাবের সম্পর্ক আছে। আলেকজাণ্ডার যেন একটি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করে। মারিয়ার ঘরটি নিরাভরণ, সর্বত্র একটি শুচিতার ভাব বিরাজমান। মারিয়া তাকে হাত-পা ধোয়ার জল দেয়। এইসব কিছুর মধ্যেই শুদ্ধিকরণের একটি দ্যোতনা থাকে। আলেকজাণ্ডারের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি সবে শুরু হয়। আলেকজাণ্ডার অর্গানে একটি 'প্রেলুড পিস' বাজায়। সঙ্গীতটি যেন তার প্রকৃত সত্তা প্রকাশের প্রস্তুতি সূচিত করে। সে মারিয়ার কাছে স্বীকারোক্তি করে। কারণ একমাত্র এই পবিত্রতার প্রতিমূর্তির কাছেই নিজেকে সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা যায়। মাকে খুশি করার জন্য আলেকজাণ্ডার তার মার বাড়ির সামনে অযত্নে পালিত বাগানের ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করে। বাগানের পরিবর্তিত রূপ দেখে আলেকজাণ্ডার আতঙ্কিত হয়—কোথায় গেল বাগানের সেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য! এই বাগানের উপাখ্যানটি যেন আলেকজাণ্ডারের জীবনের প্রতিরূপ। অর্থ ও খ্যাতির মোহে সে তার স্বাভাবিক মানবধর্মকে ভুলে গিয়েছিল। একটি কৃত্রিম জীবনের নিগড়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। আলেকজাণ্ডারের আত্মিক সঙ্কট এরই অনিবার্য পরিণতি। সে এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে চায়, মারিয়াকে বলে তাকে গ্রহণ করতে। মারিয়া দ্বিধাগ্রস্ত হয়। আলেকজাণ্ডার তার মানসিক দ্বন্দ্বের এই অন্তহীন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। সেই মুহূর্তে বোমারু বিমানের গর্জনে সারা পৃথিবী কেঁপে ওঠে। মেষপালকের ডাক ভেসে আসে। পরমুহূর্তে ঘটে মারিয়ার সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের মিলনের এক 'অলৌকিক' ঘটনা। 'অলৌকিক' যেহেতু দৃশ্যটি বস্তুত পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনেরই দ্যোতনা আনে। প্রকৃতি এখানে মঙ্গলময়ী নারী। রবীন্দ্রনাথের উপনিষদীয় ভাবনার সঙ্গে এই গূঢ়ার্থটির আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদে বর্ণিত প্রকৃতির

সংহার-মূর্তিটি কোনদিনই মেনে নিতে পারেননি। এই মিলনে সব দ্বন্দ্বের অবসান হয়, জগত তার ভারসাম্য ফিরে পায়। 'অলৌকিক' এই অর্থেও—শিল্প-সৃষ্টির পরিণতি একমাত্র এই 'অলৌকিকতা'-কে ছুঁয়েই, বাস্তবের এক 'অবিশ্বাস্য' অতিক্রমণেই।

পৃথিবীর সব রঙ ফিরে আসে। আলেকজাণ্ডার ঘুম থেকে জেগে ওঠে। সে বুঝতে পারে না যা-যা ঘটেছে সেগুলি স্বপ্ন না বাস্তব। স কুহাচি বাঁশির সুরটি আবার শোনা যায়। বাঁশির সুরটি বিস্মরণের গর্ভ থেকে তুলে আনে ওই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি। দুঃস্বপ্নের রাতটি স্বপ্ন না বাস্তব এই প্রকারের প্রশ্ন এখানে অবান্তর, কারণ স্মৃতি তো ভবিষ্যতেরও, অন্য অর্থে সময় সীমার মধ্যে আলেকজাণ্ডারের আত্মিক সংকটেরই অভিক্ষেপ। কিন্তু আলেকজাণ্ডার তার সঙ্কল্পে অটুট থাকে। সে আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত হয়।

জল, মাটি, বায়ু ও আগুন এই চারটি মূল উপাদান নিয়ে হিরাক্লিতাসের পৃথিবী। এক প্রলয়ঙ্কর আগুনে (কসমিক ফায়ার) এই পৃথিবী বারবার ধ্বংস হয়, প্রথম থেকে পুনরায় শুরু হয় সৃষ্টির প্রক্রিয়া। এই অন্তহীন প্রক্রিয়ায় পৃথিবী আবর্তন করে চলে। আলেকজাণ্ডার নিজের বাড়িতে অগ্নি-সংযোগ করে। দীর্ঘস্থায়ী হয় এই দৃশ্যটি। সশব্দে বাড়ির কাঠামো ভেঙে পড়ে, কাচ ভাঙার শব্দ হয়, অগ্নি-বিধ্বস্ত বাড়ি থেকে টেলিফোন বাজার আওয়াজ আসে, পিয়ানোর তারগুলি অদ্ভুত শব্দ করে ছিঁড়ে যায়—যেন হিরাক্লিতাসের ওই প্রলয়ঙ্কর আগুনেরই পুনরাবৃত্তি। এই বিধ্বংসী আগুনে সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, শুরু হয় এক নতুন জীবনের অন্বেষণ, আলেকজাণ্ডারের পরম শুদ্ধিকরণ, তার নবজন্মের সূচনা। এই ভাবে সম্পূর্ণ হয় একটি বৃত্ত।

আদেলেইদ, ভিক্তর, মার্তা, জুলিয়া ছুটে আসে। আলেকজাণ্ডারকে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হয়। আলেকজাণ্ডার মৌনব্রত নেয়, কারণ সে জানে, তার আত্মিক সঙ্কট এদের কাছে পাগলের প্রলাপ মাত্র, এই বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কাছে তার আত্মোৎসর্গ অর্থহীন। এই প্রসঙ্গে যিশুর আত্মত্যাগের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। যদিও এই ধরণের তুলনা কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক, তবু এই দুয়ের মধ্যে একটি ভাবগত যোগসূত্র দেখা যায়। যিশু ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যখন মৃত্যুবরণ করেন কতিপয় ভক্ত ছাড়া কেউ তাঁর এই মহান মৃত্যুবরণের তাৎপর্য বুঝতে পারেনি বরং বিদ্রূপ ও অপমানে তাঁকে জর্জরিত করেছিল। 'যিশুকে তিনি (প্রদেশপালক পন্তিয়াস পিলাত) কশাঘাত করলেন। তারপর তাঁকে ক্রুশে দেবার জন্য সৈন্যদের হাতে তুলে দিলেন।

…তাঁর গায়ে থুতু দিতে লাগল তারা (সৈন্যরা)। সেই নল ডাঁটাটা কেড়ে নিয়ে তা দিয়ে তাঁর মাথায় মারতে লাগল। …যারা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তারা তাঁকে যা-তা বলে অপমান করতে লাগল…যে দুজন দস্যুকে তাঁর সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তাঁরাও সেই একইভাবে তাঁকে নোংরা ভাষায় টিটকিরি দিচ্ছিল' (সাধু মথির মঙ্গল-সমাচার)। মানুষের ইতিহাসে এই ঘটনা টি বারবার ঘটে। যাঁরাই মানুষের মুক্তির জন্য নিজের শরীরে সমস্ত পৃথিবীর গ্লানি, পাপ ও যন্ত্রণা তুলে নেন, তাঁরাই হন মূঢ়, আত্মবিস্মৃত জনতার উপহাসের পাত্র। কিন্তু তাঁদের এই আত্মত্যাগেই পৃথিবী বার বার নতুন করে উজ্জীবিত হয়। যিশুর আত্মত্যাগ এই আদি, ও অকৃত্রিম মানব প্রেমেরই এক মহান চিত্রকল্প। তারকোভস্কি চিত্রকল্পের এই ব্যঞ্জনাটিকেই এখানে রূপ দিতে চেয়েছেন। যিশুও তো রক্ত-মাংসের মানুষ ছিলেন। তিনিও শেষপর্যন্ত যন্ত্রণা সহ্য করতে পারেন না, 'আমার ঈশ্বর, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছ ?' এই আর্তি যিশুর আত্মত্যাগে একটি অনন্য মানবিক মহিমা অর্পণ করে। যিশুর 'ঈশ্বরত্ব' তাঁর মানব প্রেমেরই পরম অভিব্যক্তি। আত্মোৎসর্গ তো আসলে ভালবাসারই চরম প্রকাশ। এইভাবেই আলেকজাণ্ডারের আত্মাহুতি ওই চিরন্তন চিত্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়।

শেষ দৃশ্যে আমরা প্রথম দৃশ্যের জায়গাতেই ফিরে আসি, একই কার্যের পুনরাবৃত্তি হয়, তবে এখন শুধু আলেকজাণ্ডারের পুত্রটিই থাকে। মৃত গাছে জল দেওয়ার পর সে গাছের নীচে শুয়ে পড়ে। উপরের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আদিতে ছিলেন বাণী, কেন বাবা ?' প্রশ্নচিহ্ন ছাড়া এই কথাটি আমরা সাধু যোহনের মঙ্গল-সমাচারে পাই। এখানে আমরা মঙ্গল-সমাচারের অনুবাদক সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা শুনব। 'বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অস্তিত্ব পাওয়ার আগেও বাণী ছিলেন। …বাণী…শব্দটির…দার্শনিক অর্থ ঈশ্বরের সেই পরম বুদ্ধি-শক্তি, বিশ্ব-জগতের সব কিছুই যা নিয়ন্ত্রিত করে রাখে'। অর্থাৎ বাণী বস্তুত ওই পরম শক্তির প্রকাশ। আবার 'বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে' (সাধু যোহনের মঙ্গল-সমাচার)। অর্থাৎ 'এই 'সঙ্গে' কথাটির মধ্যে পিতা ও পুত্রের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য এবং জীবনগত মিলন সূচিত হয়েছে' (সজল বন্দ্যোপাধ্যায়)। 'বাণী ছিলেন ঈশ্বর' (সাধু যোহনের মঙ্গল সমাচার)। অর্থাৎ 'সেই জীবনগত মিলন আসলে রূপগত ঐক্য।' …একটু পরে যোহন স্পষ্টই বলবেন, বাণী বলতে স্বয়ং ঈশ্বরপুত্রকেই বোঝায়' (স. ব.)। অর্থাৎ, যে যিশু, একাধারে রক্তমাংসের মানুষ এবং ঈশ্বরও, তিনি আবার ঈশ্বরপুত্রও। তিনি

তাঁর আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-প্রক্রিয়াটিকেই ক্রিয়াশীল রাখেন। আলেকজাণ্ডার ও তার পুত্রের সম্পর্ক বস্তুত ওই চিরন্তন জৈবিক সম্পর্কেরই অভিব্যক্তি। পিতার জীবন পুত্রে অর্পিত হয় এবং এই ভাবে একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। আবার পুত্রের ওই জিজ্ঞাসাতেই আরেকটি বৃত্তের আবর্তন শুরু। এই জিজ্ঞাসার উত্তর থাকে জলদানে। অর্থাৎ একটি সৃষ্টিকার্যের মধ্যে। কারণ সৃষ্টিই একমাত্র সত্য। ক্যামেরা গাছটি ধরে ওপরে উঠে যায়। 'সাধু মথির প্যাশন' সঙ্গীতটি পুনরায় বেজে ওঠে। এইভাবে সূচিত হয় মানুষের অন্তহীন যাত্রা। এবং শিল্পেরও। □

সংযোজন

সভ্য জগতের কোলাহল, ব্যস্ততা মুক্ত এক শান্ত, নীল সমুদ্রপারের সবুজ প্রকৃতিময় জগতে থাকে প্রফেসর, অভিনেতা, নন্দনতত্ত্বের সমালোচক এই প্রৌঢ় বুদ্ধিজীবী তার স্ত্রী, কন্যা, শিশুপুত্র ও বন্ধুসহ বাস করে এক স্বপ্নের প্রাসাদে। শুরুতে দেখি শিশুপুত্র গোসেনকে নিয়ে দীর্ঘ নিষ্পত্র এক ইকেবানাগাছের কাণ্ড পোঁতে সে। এই আশায়, ভবিষ্যতে তা পত্র-পুষ্পে পল্লবিত হবে। বাকরুদ্ধ গোসেনকে ঘিরে তাঁর কত আশা-আকাঙ্ক্ষা। তাকে এক উপকথাও শোনায় সে : এক সন্ন্যাসী মৃতপ্রায় একটি গাছকে প্রতিদিন একই সময়ে একই ভাবে জল দিয়ে ফুলে ফলে উজ্জীবিত করেছিল। তারপরই আলেকজাণ্ডার বলে, সবাই যদি এরকম করত তাহলে পৃথিবীটাকে পালটাতে পারত, কিন্তু তা সম্ভব নয় (?) এই সময় দূর মাঠের মধ্যে দিয়ে সাইকেল চালিয়ে অটো আসে। আলেকজাণ্ডারের বন্ধু অটো জন্মদিনে শহরের বন্ধুদের পাঠানো অভিনন্দন-বার্তা শুনিয়ে যায়। সারা বাড়িতে আলেকজাণ্ডার একা ঘুরে বেড়ায়। তার মনের ভিতর ভয়, বিষাদ আর একাকীত্ব। কারণ সে বলে, সভ্যতার সঙ্কট আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব বিকাশের অসামঞ্জস্যতা। বিজ্ঞানের উন্নতি এবং অবদানের পিছনে ছিল মানুষের আত্মত্যাগ, কিন্তু বিজ্ঞানকে বারবার অশুভ, অমঙ্গলজনক কাজে ব্যবহার করার পরিণতি বিশ্বযুদ্ধ এবং মানব সভ্যতার ধ্বংস। সভ্যতার আসন্ন ধ্বংসলীলা সে অনেক আগেই টের পেয়েছে। তাই সে ভীত, সন্ত্রস্ত। বিষাদগ্রস্ত মন, ভয়ার্ত অনুভূতি তাঁকে নিঃসঙ্গ করেছে। এই সঙ্কটকে সে বয়ে বেড়ায় একা। সমগ্র পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন আলেকজাণ্ডার, ক্রমশ তাঁর বিষণ্ণ অস্থিরতা, সঙ্গহীন

জটিলতা উন্মোচিত হতে থাকে। সে খুঁজে বেড়ায় সরল, মুক্ত ও বলিষ্ঠমানব-মানবী, যাঁরা এখনও যন্ত্র সভ্যতার কৃত্রিমতায় সংক্রামিত নয়। সে ফিরে যেতে চায় তাঁদের কাছে। 'রিচার্ড দ্য থার্ড' বা 'ইডিয়ট'-এর অভিনয় সে ছেড়ে দিয়েছে কারণ; সে ক্রমাগত তার অহং থেকে মুক্ত হয়ে হারিয়ে যাচ্ছিল অভিনীত চরিত্রের মধ্যে। ব্যক্তিসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় সে। আধুনিক সভ্যতা প্রতিমুহূর্তে তা নষ্ট করে দিচ্ছে। ব্যক্তি মানুষকে সামাজিক করার নামে ব্যক্তির আত্মিক শক্তির বিকাশে ব্যাঘাত ঘটায়। এরপর আসে ভয়ঙ্কর রাত্রি। টি ভি-র পর্দায় বিধ্বংসী পারমাণবিক যুদ্ধ ঘোষণা হয়। সবাই আতঙ্কে অস্থির হয়ে ওঠে। হতাশায় দিশেহারা হয়ে পড়ে। আলেকজাণ্ডার বলে ওঠে, এই দিনটির জন্যই সে অপেক্ষা করছিল। সে জানত এরকম একটা মুহূর্ত আসন্ন। চোখের সামনে রঙিন, বিবর্ণ ক্ষণস্থায়ী ইমেজ ভেসে ওঠে। জনমানবহীন বরফ আচ্ছাদিত মৃত্যু উপত্যকা, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে বেঁচে ওঠার জন্য মানুষের উদভ্রান্ত প্রচেষ্টা। নিদ্রিত গোসেনের শয্যা কক্ষ। ঘুমন্ত আলেকজাণ্ডারের পাশে ঘাসে বসে আছে আদেলেইদ। কন্যা মার্তা নিরাবরণ অবস্থায় করিডোর দিয়ে মুর্গি তাড়াতে তাড়াতে চলে যায়। অ্যাডোরেশন অফ দ্য ম্যাজাই। ছবি শুরুও হয়েছিল দ্য অ্যাডোরেশন অফ দ্য ম্যাজাই থেকে। তখন বাখের এক বিষণ্ণ সঙ্গীত বাজছিল। মেরির কোলে যিশু, সে তার ছোট্ট কোমল হাত বাড়িয়ে ছুঁয়েছে রাজার হাতে ধরা এক পাত্রকে। জাগতিক সমস্ত ভাল-মন্দের মাঝেও নির্মল সরলতা। যিশুর আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে একটা সময় পৃথিবী ধর্মীয় পাপাচার থেকে মুক্ত হয়েছিল। আলেকজাণ্ডার এই রাত্রে সমস্ত মানবজাতি এবং সভ্যতাকে বাঁচাবার জন্য আত্ম-নিবেদনের অঙ্গীকার করে—প্রভু, এই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত থেকে আমাদের বাঁচাও। আমার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে মুক্ত কর। আমার সমস্ত কিছুকে আমি পরিত্যাগ করব। যে পরিবারকে আমি ভালবাসি, আমার শিশু পুত্র তাকে ছেড়েও আমি চলে যাব। আমি মৌন হয়ে যাব। আমার ঘর বাড়ি,মূল্যবান আসবাবপত্র সব ধ্বংস করে ফেলব। যা কিছু আমাকে জীবনের প্রতি আসক্ত রাখে সব কিছু আমি ত্যাগ করব। যদি তুমি যা কিছু যেমন আছে তেমনি রেখে দাও। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে একদিন মানুষেরই আত্মদান ছিল আর আজকের আসন্ন ধ্বংসের অগ্রগতি প্রতিরোধে আলেকজাণ্ডারের আত্মদানের অঙ্গীকার। লিওনার্দোর ছবি এবং যিশু যেমন দক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে উপস্থিত তেমনি তাৎপর্যময় এবং ব্যঞ্জনা-পূর্ণ ছবির সমগ্র প্রকৃতি এবং সত্তা। অটো অন্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগী

হতে ইতিহাস শিক্ষকের চাকরি ছেড়েছে। অবসর সময়ে পোস্টম্যানের কাজ করে। আলেকজাণ্ডারের জন্মদিনে সে একটি সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপের মানচিত্র উপহার দেয়। অ্যাডোরেশন অব্ ফ্রী কিং ছবি দেখে সে ভয়ে পাথর হয়ে যায়। আলেকজাণ্ডারকে বলে, লিওনার্দো তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। অলৌকিক ঘটনার অনুসন্ধানকারী অটো জানায় আসন্ন বিপদ থেকে বাঁচতে হলে এই রাত্রে আলেকজাণ্ডারকে পরিচারিকা মারিয়ার কাছে গিয়ে রাত্রি যাপন করতে হবে। কারণ সে জানে মারিয়া একজন জাদুকরী ডাইনী। সেই পারে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে। ভারাক্রান্ত আলেকজাণ্ডার লিওনার্দোর ছবি দেখতে দেখতে অটোর কথায় সংক্রামিত হয়ে হঠাৎ আশার ক্ষীণ আলো দেখতে পায়। শান্ত সরল মারিয়ার মধ্যে সে খুঁজে পায় মাতা, প্রেমিকা, পরিত্রাতার মানসমূর্তি। উদভ্রান্ত আলেকজাণ্ডার ছুটে যায় মারিয়ার ঘরে। শোনায় বাগানের গল্প। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার কৃত্রিমতা, স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও সারল্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। মারিয়ার কাছে সে ভালবাসার আবেদন জানায়। আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে। আসলে আলেকজাণ্ডারের ধারণা আর তার আতঙ্কিত মস্তিষ্কে আটকে থাকে না, বিষাদগ্রস্ত হৃদয়ের উপলব্ধিতে পরিণত হয়ে যায়। সকাল হতেই সে পরিবারের সকলকে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে বাড়িতে আগুন লাগায়। স্টিরিওতে চাপিয়ে দেয় জাপানি বাঁশির সুর। যে আলোর ঠিকানায় মানব সভ্যতার যাত্রার সূচনা হয়েছিল, সে আলোকপথের মাঝে জমেছে আঁধার; ছবি শুরুর দিনেও আলোয় ছিল না উজ্জ্বলতা, ছিল অস্পষ্ট আঁধারের আভাস। সভ্যতার অন্ধকারময় ভবিষ্যত আশঙ্কা আলেকজাণ্ডারের মনে জমাট বেঁধেছিল রাত্রে। যথার্থভাবে উপযোগী আলোছায়ার নিয়ন্ত্রণে বাঁধা দৃশ্যকল্প। রাত্রে আলেকজাণ্ডার আর অটো যখন দূর থেকে ভেসে ওঠা প্রকৃতির ধ্বনিময় ব্যঞ্জনা টের পাচ্ছে, তখন তাদের মতো আমরাও চলে যাই সেই বিলীয়মান স্বরে ভর করে সঙ্গীতহীন অদ্ভুত বিষাদময়তায়।

সেই বন্ধ্যাগাছকে ফলবতী করতে শিশুপুত্র গোসেনের অবিচল নিষ্ঠা, ছোট শিশু তার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে ধীর পায়ে বয়ে নিয়ে আসে বালতি ভর্তি জল গাছটির কাছে। জল-সিঞ্চনের পর সে আশ্রয় নেয় গাছের নীচে। গাছের কোলে মাথা দিয়ে সে ওপরে তাকায়। ক্যামেরা গাছের কাণ্ড বেয়ে ধীরে টিল্ট আপ করে ন্যাড়া ডালপালার ওপর থামে। দূরে দেখা যায় সমুদ্রের নীল জল রেখা। বাকরুদ্ধতাকে ভেঙে গোসেন প্রথম কথা বলে।

মানব সভ্যতার ভবিষ্যত কোথায়, তার উত্তর খুঁজতেই আলেকজাণ্ডারের আত্মিক অনুসন্ধান। রাত্রি পার হয়ে ছবি শেষ হয় বৃষ্টিস্নাত দিনের আলোয়। যে অজ্ঞাত সত্যের জমি খুঁজে পেতে আলেকজাণ্ডারের আত্মাহুতি সেখানেই আর এক নবজন্মের অন্বেষণ। দূরে জল, ন্যাড়া ডালপালা, সম্ভাবনারই দ্যোতক, তারকোভস্কির ভাষায় খুবই সিনেমাধর্মী উপাদান, যা রহস্যময় ও গতি, গভীরতা এবং পরিবর্তনের বোধ চারিয়ে দেয়।

আধুনিক সভ্যতা, যন্ত্রজীবন, কৃত্রিমতা-পীড়িত যে জীবন থেকে মুক্তি পেতে আলেকজাণ্ডার পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল, সেই পৃথিবীর চেতনা, তার দুঃসহ চাপ এড়িয়ে নিজের কাছ থেকে পালিয়ে শান্তি পায়নি সে। এ শুধু যান্ত্রিকতা, কৃত্রিমতা, ধ্বংসোন্মুখী নয়। বীজ বাসা বেঁধে ফেলে মানুষের গভীর অন্তঃস্থলে। ধীরে ধীরে তা কুড়ে কুড়ে ক্ষয় করে তার সুস্থ চেতনা। তাই দেখি আলেকজাণ্ডার কেমন ভয়ের নিগড়ে আটকে পড়ে অস্থির হয়। ভারাক্রান্ত হয় তার ভিতরের দ্বন্দ্ব আর সংশয়ে। সমগ্র ছবি জুড়ে তারকোভস্কি সম্ভবত প্রশ্ন তোলেন যে, আধুনিক সভ্যতাই কি মানুষের মনে এমন সন্ত্রাস সঞ্চারিত করল, সভ্যতার অগ্রগতিতেই কি অন্তর্নিহিত রয়েছে বিধ্বংসী বীজ? আলেকজাণ্ডার এই অগ্রগতির উপযোগী হয়ে উঠল নাকি সভ্যতার অস্থির গতিতে সে উদভ্রান্ত হয়ে নিজের বাড়িতে আগুন লাগাল? 'স্যাক্রিফাইস' আলেকজাণ্ডারের আত্মাহুতির সরল কাহিনী নয়। তার অবস্থানও সময়ের সহজ পথে এগোয় না। সমস্ত ছবিটিকে এক অকৃত্রিম সারল্যের অনুসন্ধান বলে মনে হয়।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির চিত্রকলা যেমন ছবিটির প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তেমনি ছবির শব্দ সঙ্কলন, ক্যামেরার গতি, আলোকসম্পাত এবং বর্ণবিন্যাস সমগ্র ছবিটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। আড়াইঘণ্টার ছবিতে সর্বমোট ১২৬টি শট। গোটা ছবিটি তোলা হয়েছে সুইডেনের ম্লান আলোয় যেখানে দিনের আলোয় বাইরের দৃশ্যগুলিতে রয়েছে সামান্য বৈপরীত্য। ঘরের মধ্যেকার দৃশ্যগুলি রঙের দিক থেকে আরও প্রশমিত। শুরুর দৃশ্য ছিল কাট্‌ ছাড়া সাত মিনিট। ফাঁকা প্রান্তরের হাওয়ার শব্দ, শঙ্খচিলের ডাক সমুদ্রপারের থেকে ভেসে উঠে মিলিয়ে যায়। ক্যামেরা ধীরগতিতে প্যারালাল ট্র্যাকিং এবং প্যান করে এক প্রকৃতিকে জীবন্ত করে তোলে। শেষের দৃশ্যটিও দীর্ঘ ১০ মিনিটের। ক্যামেরার গতি আর ছবির ঘটনার গতি যেমন মিলেমিশে একাকার তেমনি তার আলো ও ছায়া, শব্দ ও নিঃস্তব্ধতা মিলেমিশে স্থাপত্যময় এক অবিস্মরণীয় শিল্প সৃষ্টি। □

—তপন মল্লিক